VOL: 02 | NO: 01 | NOVEMBER 2020
ISSN: 2708 -7689

সংগীত শেকড়

ROOTS OF MUSIC

A Multilingual Peer Reviewed Journal

icbmbd.com
poetnazrul.com

ICBM International Center for Bengali Music
আন্তর্জাতিক বাংলা সংগীত কেন্দ্র

আজাদ রহমানের সুরে নঈম গওহরের কথায় দুটি অবিস্মরণীয় গান: প্রেক্ষাপট এবং সাংগীতিক সৌকর্য

ড. পদ্মিনী দে
সহযোগী অধ্যাপক
সংগীত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

সারসংক্ষেপ

বিশ্বের ইতিহাসে ভাষার স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের দৃষ্টান্ত একমাত্র বাংলাদেশেরই রয়েছে। এই অভূতপূর্ব ঘটনার জন্যে বিশ্ব মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি বাংলাদেশের একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। বাংলাদেশে দেশমাতৃকার বন্দনামূলক যে সমৃদ্ধ গানের ভাণ্ডার রয়েছে তার মধ্যে 'জন্ম আমার ধন্য হলো' এবং 'পূবের ঐ আকাশে সূর্য উঠেছে' গান দুটির জন্মকথা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। গান দুটির গীতিকার নঈম গওহর এবং সুরকার আজাদ রহমান। বাঙালি জাতির মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান- এর দিক-নির্দেশনায় সৃষ্টি হয়েছিল এই দুটি অনবদ্য গান। গান দু'টির মধ্যে প্রথমটির স্থান বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের পরের সারির দু'একটি গানের মধ্যে এবং অপরটি সেই গান, যে গান স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, এমনকি ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার প্রাক্কালে বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান কার্যক্রম শেষ করার পূর্বে যে গানটি বাজানো হতো এটিই সেই ঐতিহাসিক গান। এই গান দুটি বাঙালি জাতির এক অমূল্য সম্পদ। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর দেশপ্রেমের চেতনায় শাণিত এই গান দুটি তাই বাংলা গানের ইতিহাসে চিরভাস্বর। গান দুটি ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের করাচী ই.এম.আই গ্রামোফোন কোম্পানিতে নির্মিত। গান দুটির বাণী, সুর এবং গায়কী মিলে এক অভুতপূর্ব সাংগীতিক সৌকর্য, এবং উদ্দীপনা তৈরি হয়েছিল যা কেবল বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নয় বরং বাঙ্গালির যে কোনো ক্রান্তিলগ্নে আশ্রয় হিসেবে গ্রহণীয়।

Abstract

Bangladesh is the only country in the history of the world to have achieved the independence of the country centered on the freedom of language. Recognition of World Mother Language Day for this unprecedented event is a glorious chapter in Bangladesh. Among the rich patriotic songs of Bangladesh, the birth stories of the two songs 'Janma amar dhanya holo' and 'Puber oi akashe surya utheche' are of special significance. These two impeccable songs were created under the direction of the great leader of the Bengali nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. The first of the two songs is one of the next two songs in the national anthem of Bangladesh and the second is the song that was likely to be the national anthem of independent Bangladesh, even before the end of the daily program on Bangladesh Television on the eve of the declaration of Independence on March 26, 1971 this is the historical song that was played. These two songs are invaluable resource in Bengali nations. These two songs, sharpened by the patriotic spirit of Father of the Nation Bangabandhu, are therefore immortal in the history of Bengali music. The two songs were made in 1970 by EMI Gramophone Company in Karachi, Pakistan. The words, melodies and vocals of the two songs combined to create an unprecedented musical convenience, and stimulus that is acceptable not only in the war of independence of Bangladesh but also in any crisis of the Bengalis.

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ বিশ্বের সমস্ত বাঙ্গালির জন্যে অহংকার। কারণ, এই স্বাধীনতা কেবল একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের স্বাধীনতা নয়, এই স্বাধীনতা একটি জাতির কৃষ্টি এবং সংস্কৃতি চর্চার অবাধ স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা বাংলা ভাষা চর্চার স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা বাঙ্গালির স্বকীয়তা প্রমাণের স্বাধীনতা। বাঙ্গালি জাতির ইতিহাস এবং ঐতিহ্য অনেক প্রাচীন। বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডটি ১৯৭১ সালের আগে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবাঙ্গালির দ্বারা শাসিত হয়েছে। তাই বাংলাদেশের স্বাধীনতার আগে বাঙ্গালি সংস্কৃতির ক্রমপ্রবাহমান ধারায় ছিল বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা। বিশেষত ১৯৪৭ সালের পরে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীর দ্বারা এই অঞ্চলে বাঙ্গালি সংস্কৃতির চর্চায় অনবরত বাঁধার সৃষ্টি করা হয়। সে সময় বর্তমান বাংলাদেশের নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। এক সময় এই প্রতিবন্ধকতা অসহনীয় পর্যায়ে চলে যায়। তারই প্রতিবাদ করতে গিয়ে জন্ম হয় বিদ্রোহের এবং তা আস্তে আস্তে ঘনিভূত হয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধের রূপ নেয় ১৯৭১ সালে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছিলেন, 'তোমাদের যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত হও।' এখানে 'যার যা কিছু' বলতে বঙ্গবন্ধু সম্ভবত যার যে ক্ষেত্রে শক্তি এবং মেধা রয়েছে তাকেই যুদ্ধের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের কথা বলতে চেয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ সম্প্রতি ইউনেস্কো কর্তক বিশ্ব ঐতিহ্যের দলিল হিসেবে ঘোষণা করায় এটি প্রমাণিত হয় যে, এই ভাষণ কেবলমাত্র বাঙ্গালি জাতির মুক্তির বাণী নয় বরং এটি বিশ্বের সমস্ত মুক্তিকামী মানুষের একটি আদর্শ বাণী। বাঙ্গালি জাতির সংকট থেকে উত্তরণের জন্যে বিভিন্ন সময়ে বঙ্গবন্ধু এইরূপ নির্দেশ প্রদান করতেন যা বাণী চিরন্তনী হিসেবে বিবেচনা করা যায়। এইরূপ একটি ঘটনা বাংলাদেশের সংগীত জগতের কিংবদন্তি সুরকার, আজাদ রহমানের স্মৃতিতে উজ্জ্বল।

আজাদ রহমান একজন স্বনামধন্য সঙ্গীতজ্ঞ। তিনি একাধারে সুরকার, সঙ্গীত পরিচালক, সংগীত শিল্পী, গীতিকার, চলচ্চিত্রনির্মাতা, সংগীত শিক্ষক ছিলেন। এছাড়াও বাংলা ভাষায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চর্চা, প্রচার ও প্রসারে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। এই মহান সঙ্গীতজ্ঞ পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার নওয়াদা গ্রামে ১৯৪৪ সালের পহেলা জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম খলিলুর রহমান এবং মাতার নাম আশরাফা খাতুন। সাংগীতিক পরিবেশেই তাঁর শৈশব কেটেছে। পিতা খলিলুর রহমানের কাছে তিনি সংগীতের হাতে খড়ি নেন। পরবর্তীতে তিনি কলকাতায় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীতে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি তানসেন পান্ডে, রমেশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, তারাপদ চক্রবর্তী, অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, নেপাল আঢ্য, মায়া সেন প্রমুখ সঙ্গীত শিক্ষকের কাছে সঙ্গীতে তালিম গ্রহণ করেন। ১৯৬৫ সালে তিনি পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে তৎকালিন পূর্বপাকিস্তানে চলে আসেন। এরপর থেকে তিনি বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে সমৃদ্ধ করে গেছেন নানাভাবে। গত ১৬.০৫.২০২০ তারিখে এই গুণি সংগীতজ্ঞ পরলোকগমন করেন।

কালজয়ী গানের গীতিকার নঈম গওহর সমস্ত বাঙালির হৃদয়ে আসন করে নিয়েছেন দেশপ্রেমের গান রচনার মাধ্যমে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁর রচিত গান ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণার উৎস। এই গুণি ব্যক্তিত্ব ১৯৩৭ সালের ১৫ আগস্ট মুন্সিগঞ্জ জেলার রামপাল ইউনিয়নের সিপাহিপারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 'পূবের ঐ আকাশে সূর্য উঠেছে', 'জন্ম আমার ধন্য হলো', 'নোঙ্গর

তোল তোল' ছাড়াও তিনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের জন্য অসংখ্য গান রচনা করেন। তিনি বাংলাদেশের অহংকার। ১৯১২ সালে তিনি স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত হন। ২০১৫ সালের ৭ অক্টোবর এই গুণি গীতিকার পরলোকগমন করেন।

১৯৬৮/৬৯ সালের কোনো এক সময়। সে সময়কার ঢাকায় 'শাহবাগ হোটেলে'র লিফ্‌টের সামনে অপেক্ষারত বঙ্গবন্ধুকে দেখে আজাদ রহমান সালাম দিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখে বঙ্গবন্ধু বললেন 'কই আজাদ, জোরালো গান কই? আরো জোরালো গান চাই। আজাদ রহমান তাঁর স্বভাবসুলভ বিনয়মিশ্রিত মৃদু হাসিমুখে মাথা ঝুঁকিয়ে তাঁর প্রতি সম্মান জানালেন। কথা বলতে বলতে লিফ্‌ট চলে এলো এবং বঙ্গবন্ধু প্রস্থান করলেন। কিন্তু মহান নেতার কথাটি আজাদ রহমানের অন্তরে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো 'আরো জোরালো গান চাই' ... 'আরো জোরালো গান চাই'। আজাদ রহমান ভাবতে লাগলেন কি করা যায়। সে সময়ে তিনি রেডিওতে চাকুরী করতেন। কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে তিনি করাচি যান বেড়াতে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিখ্যাত গীতিকার নঈম গওহর। করাচিতে তখনকার ই.এম.আই গ্রামোফোন রেকর্ড কোম্পানির এম.ডি রাশেদ লতিফ এবং তাঁর স্ত্রী রোজি লতিফের সঙ্গে আজাদ রহমানের সাক্ষাত হওয়াতে তাঁরা আজাদ রহমানকে কিছু গান রেকর্ড করার জন্যে অনুরোধ করেন। আজাদ রহমান রাজী হয়ে যান এবং মনে মনে বঙ্গবন্ধুর সেই নির্দেশ বাস্তবায়ন করার সংকল্প নেন। বঙ্গবন্ধুর সেই উক্তির কথা জানিয়ে আজাদ রহমান নঈম গওহরকে অনুরোধ করেন দুটি 'দেশাত্মবোধক গান' লেখার জন্যে। সে সময়ে নঈম গওহর যে গান দুটি লিখেছিলেন এবং আজাদ রহমান তাতে সুর করে সংগীত পরিচালনা করেছিলেন তা পরবর্তী কালে বাঙালি জাতির একটি অমূল্য সম্পদে পরিণত হয়েছে। গান দুটি হলো ' পূবের ঐ আকাশে সূর্য উঠেছে আলোকে আলোকময় জয় জয় জয় জয় বাংলা' এবং 'জন্ম আমার ধন্য হলো মাগো এমন করে আকুল হয়ে আমায় তুমি ডাকো'। গ্রামোফোন রেকর্ডে গান দুটি প্রকাশ হওয়ার পর রীতিমতো একটি আলোড়ন সৃষ্টি হয়। বিশেষত 'পূবের ঐ আকাশে' গানটিতে যে উদ্দীপনা ছিল তা বাঙালিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণে। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের আগে এই গানটি যে কি পরিমাণ জনপ্রিয় ছিল তা ১৯৭১ সালের ৬ই মার্চ ভারতের কোলকাতা থেকে প্রকাশিত আনন্দবাজার পত্রিকার একটি খবর থেকে জানা যায়। প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত খবরটির শিরোনাম 'জয় বাংলা'। বিশেষ প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রাপ্ত খবরটি ছিল:

> জয় বাংলা শ্লোগানে পূর্ব-পাকিস্তান যখন উত্তাল, তখন কলকাতায় বসে সদ্য ঢাকা প্রত্যাগত এক ভদ্রলোকের বাসায় জয় বাংলা রেকর্ডটি শুনলাম। ভদ্রলোক বললেন জানেন, এই গানটি এখন পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে সবচেয়ে বড় প্রেরণা। পূর্ব বাংলায় হাজার হাজার মানুষের মুখে মুখে এখন এই গান। অনেকে মনে করছেন, পূর্ববঙ্গের এটিই হবে জাতীয় সংগীত। জয় বাংলা রেকর্ড বার করেছেন পূর্ব পাকিস্তান গ্রামাফোন কোম্পানী। রেকর্ডের কভারে মুজিবুর রহমানের ছবি। রাজনৈতিক নেতার ছবি দিয়ে গানের রেকর্ড এই প্রথম। গানটি পরিচালনা করেছেন আজাদ রহমান। গেয়েছেন গ্রামাফোন কোম্পানীর শিল্পীরা। গানটির কথাগুলো পড়লেই বোঝা যায়, এক বৃহত্তর সংগ্রামে বাঙালিকে উজ্জীবিত করা আর দেশাত্মবোধের মন্ত্রে জাতিকে দীক্ষিত করাই এর উদ্দেশ্য।

গানটি গাওয়া হয়েছে কোরাসে। গানের কথা:

পূবের ঐ আকাশে সূর্য উঠেছে
আলোকে আলোকময়
জয় জয় জয় জয় বাংলা।

ঘুম পাড়ানী মাসি পিসী
বেরিয়ে এস সবে
বর্গী যদি আসে তাদের
তাড়িয়ে দিতেই হবে।
তাড়িয়ে দেব তাড়িয়ে দেব
বুলবুলিকে ধান দেব
আদর সোহাগ করে
সেইতো আমার খাজনা দেওয়া
ভালবাসায় ভরে।
দস্যুগুলো পালিয়ে গেছে
আঁধার হয়েছে ক্ষয়
জয় বাংলা জয় জয় জয় জয়।

আনন্দবাজার পত্রিকা

ANANDA BAZAR PATRIKA
India's Largest Selling Daily
Saturday, March 6, 1971.

…র কি 'স্বাধীনতা'
…ণা করছেন?

শুক্রবার ঢাকায় ১২ জন নিহত

"ছয় দফা ছাড়ব না, আর ছাড়ব না বাংলা ভাষা।"—এই সপ্তাহেই ঢাকার বাংলা একাডেমির এক সভায় বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান।

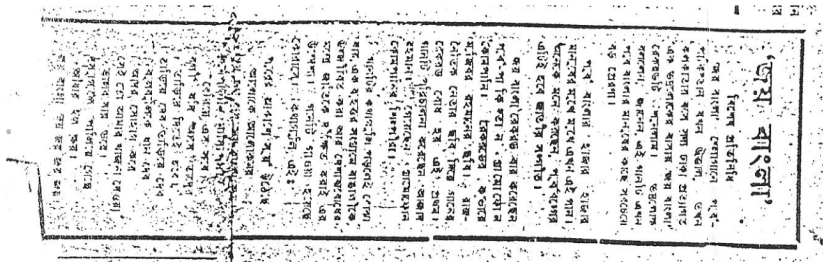

উল্লেখ্য যে, এই গানটি ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের দিন থেকে ২৬ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন রাতে টেলিভিশনের সম্প্রচার বন্ধ করার সময় বাজানো হতো। দুঃখের বিষয় এই যে, গ্রামোফোন রেকর্ডের কভার পৃষ্ঠাটি বর্তমানে কোথাও আর সংরক্ষিত নেই। গানটিতে যাঁরা শিল্পী হিসেবে অংশ নিয়েছিলেন তাঁরা হলেন, ফিরোজা বেগম, সাবিনা ইয়াসমিন, জিনাত রেহানা, নাসির হায়দার, লায়লা মোজাম্মেল, রোকসানা, আসাদুল হক, কাজী এহসান এবং আহম্মদউল্লা সিদ্দিকী। গানটি গ্রামোফোন কোম্পানী থেকে প্রকাশিত হওয়ার কিছুদিন পর পাকিস্তান সরকার যখন জানতে পারে যে, এই গানটি আজাদ রহমানের নেতৃত্বে করাচিতে রেকর্ডিং করা হয়েছে তখন সরকার থেকে তাঁকে একটি মেমো দেওয়া হয় এবং জানতে চাওয়া হয় যে, সরকার বিরোধী কাজের জন্য কেন তাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না? সে যাত্রায় আজাদ রহমান কোনো রকমে সাত-সতেরো বলে প্রাণে রক্ষা পেয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে আরও যেসমস্ত গান আজাদ রহমানের সুরে এবং তাঁর নেতৃত্বে প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

১. সংগ্রাম সংগ্রাম সংগ্রাম, চলবে দিনরাত অবিরাম- গীতিকার– ফজল-এ-খোদা।

২. রক্তেই যদি ফোটে জীবনের ফুল– গীতিকার- সৈয়দ শামসুল হুদা।

৩. কেঁদোনা কেঁদোনা মাগো আর কেঁদোনা– গীতিকার– আবু হায়দার সাজেদুর রহমান।

৪. আমার ঘরে আগুন জ্বেলেছো শান্তি নিয়েছো কেড়ে– গীতিকার– কবি হাবিবুর রহমান।

স্বাধীনতার স্বপক্ষে এইরূপ উদ্দীপনামূলক গান করার অপরাধে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে একদিন সংগীতজ্ঞ আজাদ রহমানকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ধরে নিয়ে যায় এবং সারারাত তাঁকে পিস্তলের মুখোমুখি বসে থাকতে হয়। ভাগ্য অত্যন্ত সুপ্রসন্ন হওয়ায় সেবারও দু'একজন শুভানুধ্যায়ীর সহযোগিতায় আজাদ রহমান কোনোরকমে প্রাণে বেঁচে যান। জীবন এবং জীবিকাকে বাজি রেখে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন এই সমস্ত কালজয়ী গান। বঙ্গবন্ধুর মত একজন মহান নেতার নির্দেশ তিনি কিছুটা হলেও রক্ষা করতে পেরেছিলেন এটাই তাঁর কাছে জীবনের পরম প্রাপ্তি। যে বাংলায় আজাদ রহমান হাসতে পারেন, কাঁদতে পারেন, হৃদয়ের সবটুকু আবেগকে উজাড় করে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারেন, এই বাংলার মাটিই যেন তাঁর শেষ ঠিকানা হয়, এটাই তাঁর জীবনের একমাত্র চাওয়া ছিল।

বাংলার ডাকে নঈম গওহর যেভাবে আকুল হয়েছিলেন, একইভাবে এই মর্মবাণী আজাদ রহমানকেও সমানভাবে আন্দোলিত করেছিল। তাই নঈম গওহরের কথায় এবং আজাদ রহমান সুরে 'জন্ম আমার ধন্য হলো মাগো' গানটির মর্মস্পর্শী বহিপ্রকাশ ঘটেছে। হৃদয়ের আবেগ প্রকাশের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম হলো সুর। কথার আবেগ এবং সুরের আবেগ একত্রে যখন একে অন্যের পরিপূরক হয়ে ওঠে তখনই গানে প্রানের সঞ্চার হয়। কেবলমাত্র কথার কিংবা কেবলমাত্র সুরের স্বতন্ত্রভাবে সেই স্তরে পৌঁছানোর সামর্থ নেই। অর্থাৎ এই গানটির জন্ম না হলে স্বতন্ত্র কবিতা হিসেবে কিংবা স্বতন্ত্রভাবে কোন যন্ত্রে সুরটি পরিবেশিত হলে অনুভূতির এত স্পর্শকাতর স্তরে পৌছানো সম্ভব হতো না। বাণী এবং সুরের একান্তিক মিলন প্রসঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- এর এই উক্তিটির উল্লেখ করা যেতে পারে:

> সুরে, বাক্যে অর্ধনারীশ্বর যোগ হয়েছে। যোগের এই দুই অঙ্কের মধ্যে কে বড়ো কে ছোট সে বিচারের চেষ্টা করা উচিত নয়। উভয়ের যোগে সে সৌন্দর্য সম্পূর্ণতা লাভ করেছে উভয়কে বিছিন্ন করে দিলে সেই সৌন্দর্যকেই হারাতে হবে। জলের থেকে অক্সিজেনকে নিই বা হাইড্রোজেনকেই নিই, তাতে জলটাই যায় মারা। বাংলা পদগান জলেরই মতো যৌগিক সৃষ্টি, তা দুইয়ে মিলে অখণ্ড।[২]

দেশের প্রতি মমত্ববোধ থেকেই জন্মভূমিকে মাতৃতুল্য মানা হয়। কারণ মা মানেই মমতাময়ী যার আদরে সোহাগে, শাসনে মানুষ পরিপূর্ণতা পায়। প্রাচীন সংস্কৃত রামায়ণে একটি বাক্য আছে 'জননী জন্মভুমিশ্চ স্বর্গদপি গরিয়সী' অর্থাৎ জননী এবং জন্মভূমি স্বর্গ থেকেও শ্রেষ্ঠ। সমগ্র দেশমাতৃকার বন্দনামূলক গানে এই কথাটির তাৎপর্য নানা ভাবে প্রতিফলিত হয়। বাঙ্গালি সংস্কৃতির ইতিহাসে দেশাত্মবোধক গানের সূচনা সম্পর্কে জানা যায় "বাংলা গানে এই স্বাদেশিক প্রবণতাটি উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে দানা বাঁধতে শুরু করে"[৩]। তবে ইতোপূর্বে মাতৃভাষার চেতনায় লেখা 'নানান দেশের নানান ভাষা, বিনে স্বদেশীয় ভাষা পুরে কি আশা' নিধুবাবু (১৭৪১-১৮৩৯) রচিত গানটি বাংলায় স্বদেশীয় চেতনার একটি অনবদ্য নিদর্শন । তবে পরবর্তীতে দেশাত্মবোধের নতুন নতুন উপলব্দির প্রকাশ ঘটতে থাকে। রাজনৈতিক এবং সামাজিক এই উভয় প্রেক্ষাপটই এই প্রকাশের মূল কারণ বলা যায়। বৃটিশ শাসনামলে পরাধীনতা বাঙ্গালিকে সর্বাতোভাবে গ্রাস করেছিল। শোষণ, শাসন, বঞ্চনা, নীপিড়ণ এবং তার ফলশ্রুতিতে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে এবং অনেক আত্মত্যাগের বিনিময়ে দেশে স্বাধীনতার সূর্য উদিত হয়।

বাংলা দেশাত্মবোধক গানের বিকাশের ক্ষেত্রে 'হিন্দুমেলার' বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। হিন্দুমেলার প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৬৭ সালে। মোট চৌদ্দ বছর অর্থাৎ ১৮৬৭ সাল থেকে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত বাঙালি স্বদেশ চেতনা বা স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করার প্রচেষ্টা চলে হিন্দুমেলা' নামক অনুষ্ঠানটি সংগঠনের মাধ্যমে। সেই দুঃসময়ে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনোমোহন বসু, গনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবিন্দচন্দ্র রায়, বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমূখ গান রচনা করেন। এঁদের প্রত্যেকের গানের বাণীতে স্বাদেশিক সংগীত প্রতিভার প্রকৃষ্ট বিকাশ বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আদর্শ, পরাধীনতার বেদনা, মুক্তির ইতিহাস, দুঃখজর্জরিত অশ্রুভারাতুর দেশমাতৃকার মূর্তি, পরাধীন ভারতবর্ষের পরদ্রব্যপ্রীতি, স্বদেশী দ্রব্যের পৃষ্ঠপোষকতার অভাব, শোষণের বিরুদ্ধে মর্মজ্বালা, সাম্প্রদায়িক ঐক্যের উদার অবস্থান, পূর্ব সৌরব চৈতন্য, মাতৃভাষা প্রীতি, এই চেতনা সমূহের মূর্ত রূপ ফুটে উঠেছিল তাঁদের রচিত স্বদেশীয় সংগীতে। এই সূত্র ধরেই বাঙালির মনে দেশাত্মবোধ জাগ্রত হয়েছিল। পরবর্তীতে এর ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন গীতিকবির গানে স্বদেশানুরাগের বলিষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গানগুলি এই ধারাবাহিকতারই প্রতিফলন। ভাষা আন্দোলন, পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর অমানবিক নির্যাতন বাংলাদেশের মানুষকে করে তুলেছিল মুক্তিকামী। মানুষ তাদের প্রতিবাদ জানিয়েছে মুক্তি সংগ্রামের গানের মাধ্যমে। বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার দাবিতে বাঙালি যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল সেই চেতনায় বাঙালি

সংস্কৃতি চর্চার অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে যে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয় তাতেও সঙ্গীতের ছিল অনবদ্য ভূমিকা । এ প্রসঙ্গে জনাব আজাদ রহমান বলেছেন-

> শুধু শব্দ প্রকাশের জন্য আমরা রক্ত দিইনি। হৃদয়, বিবেক এবং আমাদের সর্বসত্বা প্রকাশিত হোক, এটাই আমাদের আকাঙ্খা। আমরা বহু প্রাণ বিসর্জন দিয়েছি ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করতে। ভাষাতো প্রতীকী শব্দ। মুক্তচিন্তা, আলোকিত মানুষ জাতপাতহীন সমাজ, সবার উপরে সনুষ সত্য। এই সকল বিষয় সম্মুখে রেখে এ দেশের আপমর জনগণের প্রথম ধর্ম নিরপেক্ষ একাত্মতা হচ্ছে ভাষা আন্দোলন। মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীনতা সংগ্রাম সবই ভাষাকে কেন্দ্র করে এগিয়েছে। সংগীতও এ লড়াইয়ে অংশ নিয়েছে প্রবল দাপটে।[৪]

ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত গান আজীবন বাঙালি জাতির দেশাত্মবোধের অনুপ্রেরণা যোগাবে তাদের মধ্যে 'ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়', 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী',' রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন করিলি রে বাঙালী', ইত্যাদি গানগুলো সর্বদা স্মরণীয় ।

দেশাত্মবোধক গান রচনার ক্ষেত্রে দুই ধরনের চেতনার প্রকাশ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়। একটি হলো রূপবৈচিত্র্যের সৌন্দর্য বর্ণনা এবং অপরটি অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। নঈম গওহর রচিত এবং আজাদ রহমান সুরারোপিত 'জন্ম আমার ধন্য হলো' গানটি অসাধারণ মর্মস্পর্শী এবং আবেগপূর্ণ ভাষায় রচিত। দেশকে মাতৃরূপে কল্পনার এটি একটি অনন্য উদাহরণ।

কথা-নঈম গওহর

সুর -আজাদ রহমান

জন্ম আমার ধন্য হলো মাগো
এমন করে আকুল হয়ে আমায় তুমি ডাকো।।
তোমার কথায় হাসতে পারি তোমার কথায় কাঁদতে পারি
মরতে পারি তোমার বুকে, বুকে যদি রাখো মাগো
এমন করে আকুল হয়ে আমায় তুমি ডাকো।।
তোমার কথায় কথায় বলি পাখির গানের মতো
তোমার দেখায় বিশ্ব দেখি বর্ণ কত শত
তুমি আমার খেলার পুতুল আমার পাশে থাকো।।
তোমার প্রেমে তোমার গন্ধে পরাণ ভরে রাখি
এইতো আমার জীবন মরণ এমনি যেন থাকি
বুকে তোমার ঘুমিয়ে গেলে জাগিয়ে দিও নাকো মাগো।।

গানটির সুরে একাধারে কীর্তনাঙ্গ, বাউলাঙ্গ এবং রাগের আবহের সম্মেলন ঘটেছে একে অন্যের সঙ্গে পরম মমতায়। দেশমাতৃকার বন্দনায় সুরের এই অভিনব সংযোজন অন্তরের শাশ্বত আবেগের বহিঃপ্রকাশ। মানবীয় স্নেহ মায়া মমতার বন্ধন দেশ মাতৃকার বন্ধন থেকে কোন অংশে কম নয়। গানটির স্থায়ীর 'এমন করে আকুল হয়ে আমায় তুমি ডাকো' এর সুরে (দা ণা া ণা সা া, সা গা া গা মগা রসা, সা গরা মা া মগা রসা সা া া সা া া) যে আকুলতা এবং মমতা প্রকাশ পেয়েছে তা যথার্থরূপে গানটিতে প্রতিফলিত। গানটির অন্তরাতে স্পষ্টরূপে কীর্তনের সুরের প্রয়োগ দেখা যায়। বিশেষ করে 'তুমি আমার' (পা ধা ণা র্সা া া া া া র্ণর্সা র্জ্ঞর্রা র্জ্ঞর্রা র্সণা ধপা পধা ণধা পপা মা া া) এই অংশের সুরকে যেভাবে প্রলম্বিত এবং কম্পিত করা হয়েছে তাতে বাংলা অঞ্চলের নিজেস্ব সুর কীর্তনের বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ পেয়েছে। "তোমার কথায় কথা বলি পাখির গানের মত"-এই অংশেও (সা গা রগা সরা ণ্সা সা সা সা সা া, সা গা মা পা মা গা) কীর্তনের সুরের কিঞ্চিত প্রয়োগ রয়েছে এবং স্থানে স্থানে বাউলাঙ্গের সুরের কিছু প্রয়োগ দেখা যায়। 'চারুকেশী' রাগের শুদ্ধতা রক্ষা না হলেও মূলত এই রাগের আবহেই গানটির সুরারোপ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে বাংলার অপরূপ সৌন্দর্যের একটি চিত্রকল্প গানটিতে প্রস্ফুটিত হয়েছে। বাংলার নিজস্ব সুর প্রসঙ্গে ড. বিমল রায় বলেছেন–

> বাংলাভাষায় লেখা মঙ্গল গান, কীর্তন, বাউল ইত্যাদি বাঙালীর নিজস্ব গান, যাকে প্রাচীন বাংলাগান বলা যায়। ... কীর্তন বা বাউল তাদের সুরের কাঠামো অবিকৃত রেখেছে। এরা প্রত্যেকেই উদ্ভুত হয়েছে বাংলার এক একটি প্রান্তের প্রাকৃতিক সুর থেকে, লোকগীতি থেকে, গ্রাম্য মেঠো গান থেকে। তারপর রাগ সংগীতের স্পর্শে এসে এদের কিছু রূপান্তর ঘটেছে, ...[৫]

উল্লেখিত গানটিতে বাংলার নিজস্ব সুরগুলোকে একত্রিত করে যথাযথভাবে যে মিলন ঘটানো হয়েছে সে কারণেই এই গানটির আবেদন সর্বস্তরে পৌছে তাকে অনবদ্য করেছে। "পূর্বের ঐ আকাশে সূর্য উঠেছে আলোকে আলোকময়" গানটি উদ্দীপনামূলক দেশাত্মবোধক গানের একটি বলিষ্ঠ উদাহরণ। গানটির বাণী অংশে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে দেশকে মুক্ত করার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছে। দেশে যে ঘোর অন্ধকার নেমে এসেছিল তাকে সরিয়ে নতুন সূর্যোদয়ের প্রত্যয়ই গানটিতে ব্যক্ত হয়েছে।

উদ্দীপনামূলক গানের সুরের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই ধরনের গানগুলোতে মীড়ের প্রয়োগ নেই বললেই চলে। পাশাপাশি স্বরের ব্যবহার কম হয়। দুরবর্তী স্বরের মধ্যে বিন্যাস বিশেষভাবে লক্ষণীয়। গাওয়ার সময় বাণীর গ্রয়োজনে কোথাও কোথাও স্বরের উপর জোর দিতে হয়। আলোচ্য গানটিতে বাণীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সুরের ব্যবহার লক্ষণীয়। সুরের ওঠানামা এক স্বর থেকে আর এক স্বরের ব্যবধান অর্থাৎ স্বরের উচ্চ-নিচতার মাধ্যমে উদ্দীপনার ভাব স্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে। অসাধারণ সুরের গাঁথুনী গানটিকে দৃঢ়তা প্রদর্শনে সাহায্য করেছে। গানটির শুরুতেই মধ্য এবং তার সপ্তকের ষড়জের ব্যবহার (সা সা র্সা া ধা ধা মা া রা া পা পা) উদ্দীপনার একটি আবহ তৈরি করে। বিশেষত স্বরের সরাসরি প্রয়োগ এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। যদি 'মীড়' প্রয়োগে এই দুই সপ্তকের ষড়জকে যুক্ত করা হতো তাহলে হয়ত উপমহাদেশীয় সংগীতের বৈশিষ্ট্য রক্ষা হতো কিন্তু গানের উদ্দীপনা তাতে ব্যাহত হতো। কারণ উপমহাদেশীয় সংগীতের সুরের বৈশিষ্ট্যগুলোর অন্যতম একটি অলংকার হলো 'মীড়' প্রয়োগ। স্থায়ী অংশে মীড়কে অপ্রধান করে যে সুর করা হয়েছে তাতে জাগরণী চেতনার উদ্দীপ্ত প্রকাশ দেখা যায়। অন্তরা অংশে 'ঘুম পাড়ানী মাসী পিসী বেরিয়ে এসো সবে' এর সুরে (মা ধা ণা র্জ্ঞর্ধা র্জ্ঞর্ধা র্সা) প্রাতকালীন রাগ আহীর ভৈরবের একটি আবহ তৈরি করে এবং অল্প মীড়ের প্রয়োগ দেখা যায়। অবশ্য পর মুহূর্তেই মীড়-বিহীন সুরের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এতে উদ্দীপনার সঙ্গে বাংলার নিজস্বতা প্রকাশ পেয়েছে। 'বুলবুলিতে ধান দেব আদর সোহাগ

ভরে' অংশের সুরে কিছুটা বাউল সুরের আভাষ রয়েছে। পরের অংশের সুরে কিছুটা ভিন্নতা থাকলেও উপর্যুক্ত সুরগত ভাবগুলিই গানে প্রকাশিত হয়েছে। গানটির মূল চেতনা হলো 'জয় বাংলা' কথাটি। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে স্লোগান দিয়েছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য, যে স্লোগান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সংগে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে যে শ্লোগান বাঙালি জাতির পরিচয় বহন করে, যে শ্লোগান ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জনগণের পরিচায়ক ছিল সেই জয় বাংলাকে কেন্দ্র করে সুরকার আজাদ রহমান ও নঈম গওহরের অমর সৃষ্টি বাঙ্গালির ইতিহাসের সঙ্গে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

উপসংহার

প্রেম একটি শাশ্বত সুন্দর বিষয়। তাই যুগ যুগ ধরে প্রেম, ভালবাসার চিরন্তন বাণী ধ্বনিত হয়েছে মহামনিষীদের কথায় এবং লেখনিতে। দেশপ্রেমের বহিপ্রকাশে অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সামাজিক মেলবন্ধন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং কৃষ্টিকে তুলে ধরা হয়। দেশের প্রতি এই টান এবং ভালবাসা মানুষের স্বভাবজাত। বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনীতে এর উজ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে। ১৯৭১ সালে দেশকে ভালবেসে দেশের স্বাধীন করার জন্যে ৩০ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। সংগীত যোদ্ধারাও এই যুদ্ধে শরীক হয়েছেন বিভিন্নভাবে। দেশমাতৃকার প্রেম-ভালবাসা উপলব্ধি করে যুগে যুগে, কালে কালে বাংলা গান সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান আজ বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত, কাজী নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের জাতীয় কবি। এর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, যোগ্যতা অনুযায়ী অবস্থান নির্ণয়ে বঙ্গবন্ধু ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ। তাইতো আজাদ রহমানের যোগ্যতা উপলব্ধি করে তিনি তাঁকে জোড়ালো গান করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তারই সূত্র ধরে নঈম গওহরের কথায় কালজয়ী গান 'জন্ম আমার ধন্য হলো মাগো' এবং 'পূবের ঐ আকাশে সূর্য উঠেছে'- এর সৃষ্টি হয়। উল্লেখিত দুটি গানে দেশাত্মবোধের চেতনার অপূর্ব প্রকাশ দেখা যায়। প্রথম গানটিতে জন্মভূমির প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা এবং স্নেহপ্রবণ সন্তানের প্রতি মাতৃরূপী জন্মভূমির মমত্ববোধ সমুজ্জল হয়ে ধরা দিয়েছে। দ্বিতীয় গানটিতে শত্রুকে পরাস্ত করে স্বাধীনতার নতুন সূর্যের আলোয় অন্ধকারের বিনাশ নিশ্চিত করার সংকল্প দৃঢ়তার সাথে প্রকাশ পেয়েছে। দেশাত্ববোধ মানুষের একটি সহজাত প্রবণতা তথাপি একে সমুন্নত ও উজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে এই ধরনের গানের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ক্রান্তিকালে গান দুটির ভূমিকা ইতিহাসের পাতায় উজ্জল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে চিরদিন। সমৃদ্ধ এই ঐতিহ্যের পথ ধরে চলার মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধত্বর হবে বাঙালি সংস্কৃতি।

তথ্য নির্দেশঃ

১. আনন্দবাজার পত্রিকা, ০৬.০৩.১৯৭১, অশোক কুমার সরকার (কলকাতাঃ পশ্চিমবঙ্গ, ভারত) পৃ. ১।

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সংগীত চিন্তা*, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৭৩, (বিশ্বভারতী গ্রন্থণ বিভাগ, কলকাতা) পৃ. ৯০ ।

৩. করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা গানের বিবর্তন (১ম খণ্ড)*, (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৯৩), পৃ. ২৫৭।

৪. আজাদ রহমান, *বাংলা খেয়াল, দ্বিতীয় খণ্ড*, (বাংলা একাডেমী ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯), ভূমিকা অংশ ।

৫. ড. বিমল রায়, *'বাঙালীর গান-রাগ তাল-'* বাংলা সংগীত মেলা স্মারক সংখ্যা ২০০৯, (১/১ আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড কোলকাতা-৭০০০২০, বৈশাখ ১৪১৬) পৃ. ১৯,২০।